জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
খণ্ড ১৫। সংখ্যা ২
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫

ISSN 2519-5816
DOI: doi.org/10.3329/jnujarts.v15i2.87978
Page: 76-91

কায়েস আহমেদের গল্প : অস্তিত্ববাদী অবলোকন

এ কে এম মাহবুবুল হক*

The Stories by Kayes Ahmed: An Existentialist Study

Abstract

Kayes Ahmed (1942-1992) is a relevant and unique writer in Bangladeshi fiction. In particular, the form and content of his stories are experimental and innovative. Kayes Ahmed is one of the few writers in Bangladeshi fiction in the seventies who adopted psychoanalytical narratives as his subject and stream-of-consciousness as his form. His stories contain artistic commentary on the fatigue, grief, melancholy, isolation, and meaninglessness of middle-class life. Riots, famine, the partition in 1947, the Liberation War in 1971 and post-liberation social chaos have also become the subjects of his stories. In fact, he embodies the struggle for existence of people in the perspective of the country and history. This article examines the struggle and potential for salvation of helpless people subjugated and devastated by the state, society, and surroundings depicted in Kayes's story in the light of existentialist philosophy. This extract shows how important the role of their class position and environment is in dealing with existential crises. The present article also analyzes the multifaceted nature of death and the advent of suicide in Kayes's stories in view of existentialist philosophy. Kayes Ahmed did not set out to create the 'free man' of existentialist philosophy in his story; he wanted to show people with minimal dignity so that others would be encouraged. One of the objectives of this article is to identify those people with the help of an existentialist reading of Kayes's stories.

মুখ্যশব্দ: কায়েস আহমেদ, অস্তিত্ববাদ, বাংলাদেশের গল্প, মধ্যবিত্ত, প্রতিবাদ, মৃত্যু, আত্মহত্যা।

* A K M Mahbubul Haq, Professor, Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka; mahbubul_haq@bangla.jnu.ac.bd

১.

কায়েস আহমেদ [১৯৪৫-১৯৯২] বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ব্যতিক্রমধর্মী, প্রাসঙ্গিক ও স্বতন্ত্র শিল্পাদর্শী লেখক। তিনি ব্যতিক্রম নিজের গল্পবলার রীতিকে ক্রমাগত নতুন মাত্রা দেওয়ার প্রয়াসে, 'কাহিনির নামে জমিয়ে কেচ্ছা বয়ান'[১] করার লোভ থেকে বিরত থাকার সংযমে, 'গড়পড়তা সাফল্যের'[২] পথে না-হাঁটার সততায়। রাষ্ট্র-রাজনীতি-ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষের অসহায়ত্ব সনাক্তকরণে; অস্তিত্বসংগ্রামের ঘূর্ণিপাকে দিশাহীন নগণ্য মানুষগুলির উপর্যুপরি পরাজয় ও ক্লেদাক্ত ক্ষত উন্মোচনের অভিযাত্রায় তিনি প্রাসঙ্গিক এবং স্বতন্ত্র। 'বিশেষত একজন বাস্তববাদী লেখক হিসেবে সমকালীন জীবনের বিরূপতা রূপায়ণে কায়েস আহমেদের তীর্যক ও ব্যঙ্গাত্মক'[৩] ভাষাভঙ্গি তাঁর কথাসাহিত্যকে বিশিষ্টস্থানীয় করে তুলেছে। অকালমৃত্যুর কারণে কায়েস আহমেদের রচনা অপ্রতুল। দেখা যায়, ষাটের দশকে লেখালেখি শুরু করলেও তার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। আবার, *নির্বাসিত একজন* [১৯৮৬]-উপন্যাসের বিজ্ঞাপন ছাপানোর দেড়যুগ পর তা আলোর মুখ দেখে।[৪] দুটি গল্পগ্রন্থ– *অন্ধ তীরন্দাজ* [১৯৭৮] এবং *লাশকাটা ঘর* [১৯৮৭]; দুটি উপন্যাস– *দিনযাপন* [১৯৮৬], *নির্বাসিত একজন* [১৯৮৭]– সবমিলিয়ে গ্রন্থসংখ্যা চার। তন্মধ্যে *অন্ধ তীরন্দাজ*-এর আটটি গল্প রচিত হয়েছিল ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে। *লাশকাটা ঘর*-এর গল্প সংখ্যাও আটটি; রচিত হয়েছিল ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে। কায়েসের অগ্রন্থিত গল্পসংখ্যা ষোলটি। তন্মধ্যে, প্রশান্ত মৃধা সম্পাদিত *অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ* [২০১০] গ্রন্থে সংকলিত আটটি গল্পের মধ্যে 'ফেরারি বসন্তকে খুঁজে' 'অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব' ও 'নৈঃশব্দ্যের ভার'– এই তিনটি বাদে বাকি পাঁচটি গল্প *কায়েস আহমেদ সমগ্র* [১৯৯৩]-তে মুদ্রিত হয়েছিল। সম্প্রতি মাহবুব লিটন সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকা *উত্তরপর্বতে* [২০২৪] কায়েস আহমেদের অগ্রন্থিত সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে যা ইতোপূর্বে কোনো গ্রন্থে স্থান পায়নি। উল্লেখ্য, 'নিরাশ্রিত অগ্নি' এবং 'ফজর আলীর গল্প' বস্তুত নামভেদে একই গল্প। প্রায় হারিয়ে যাওয়া প্রথম উপন্যাস, *কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ* [১৯৭৪] সিনেপত্রিকা *জোনাকির* পাতা থেকে উদ্ধার করে *অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ* গ্রন্থে মলাটবদ্ধ করা হয়। সুতরাং কায়েস আহমেদের গ্রন্থ সংখ্যা চার, এ যাবৎকালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস তিনটি এবং গল্প একত্রিশটি।

কায়েস আহমেদের গল্পে মানুষের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বসংকট কীভাবে রূপলাভ করে বর্তমান প্রবন্ধে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ বিষয়টি সমালোচকদের কাছে তেমন গুরুত্ব পায়নি যতটা পেয়েছে তার গল্পে চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার রূপায়ণ। সমালোচকগণ মধ্যবিত্তের মনোবিকলন, বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের কথা তুলে ধরায় কায়েসের আগ্রহ সনাক্ত করেছেন। কায়েস আহমেদের সমগ্র কথাসাহিত্য নিয়ে কোনো গবেষণা নেই যেহেতু তার রচনা এখনও উদ্ধারণীয়। ক্ষীণকায় তিনটি উপন্যাসের মধ্যে *দিনযাপন* স্বতন্ত্র দুটি গল্পের মলাটবন্দি রূপ। উপন্যাস হিসেবে ছাপা হওয়া *কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ* [১৯৭৪] মাত্র চৌদ্দ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প। সুতরাং অকালপ্রয়াত কায়েসের একটি পরীক্ষিত ও পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক অবয়ব গল্পেই প্রতিষ্ঠিত। কায়েসের গল্প নিয়ে স্বল্প-বিস্তর আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে গল্পবয়ন কৌশল ও গদ্যরীতি; কিছুক্ষেত্রে বিষয়বিন্যাসও। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখা 'জতুগৃহে দিনযাপন' এবং 'মরিবার হলো তার সাধ' নামক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ দুটিতে ব্যক্তি-কায়েস, তাঁর লেখক-মানস এবং দুটি উপন্যাসের [*নির্বাসিত একজন*, *দিনযাপন*] নির্মাণশৈলী মূল্যায়ন করা হয়েছে।[৫] তৎপূর্বে বিভিন্ন সমালোচক কায়েস আহমেদের গল্প ও উপন্যাসে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা ও মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অনিকেত-অনিশ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের চালচিত্র অঙ্কন বিষয়ভাবনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন। *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*-গ্রন্থে চঞ্চলকুমার বোস কায়েস আহমেদের 'অন্ধ তীরন্দাজ' এবং 'লাশকাটা ঘর'-এর গল্পগুলির শিল্পস্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করেছেন।[৬] আজহার ইসলাম রচিত *বাংলাদেশে ছোটগল্প: বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* [১৯৯৬] গ্রন্থে কায়েস আহমেদের গল্পের বিষয়স্বাতন্ত্র্য এবং রচনাশৈলীর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। একই লেখকের *চিরায়ত সাহিত্যভাবনা* [১৯৯৯] গ্রন্থেও কায়েসের প্রথম গ্রন্থ 'অন্ধ তীরন্দাজে'র মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে।[৭] দুজন গবেষকই মনে করেন, বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় কায়েস আহমেদ নিরীক্ষাধর্মী, সংহত ও শ্রেণিসচেতন কথাসাহিত্যিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত যে কোনো পর্যায়েই বাংলাদেশের কথাসাহিত্য আলোচনায় কায়েস আহমেদ অনিবার্য হলেও সে অনুযায়ী যথার্থ মূল্যায়িত নন। ২০১০ সালে প্রকাশিত *অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ* এবং ২০২৪ সালে *উত্তরপর্ব* সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত কায়েসের অগ্রন্থিত গদ্য থেকে লেখককে নতুন করে মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা বর্তমান গবেষণার যৌক্তিকতা নির্দেশ করে। এই গবেষণা আখ্যান বিশ্লেষণ তথা বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব অস্তিত্ববাদের [Existentialism] সারকথা ।

২.

কায়েস আহমেদের অনেকগুলি গল্পের নির্মাণশৈলীতে চেতনাপ্রবাহরীতি ব্যবহৃত হয়েছে বলে কোনো কোনো গবেষক মত দিয়েছেন।[৮] তবে এই ধারণার বিস্তারিত আলোচনা কেউ করেননি। চেতনাপ্রবাহরীতি [Stream of consciousness] ও ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণের [Freudian psychoanalysis] মধ্যে সম্পর্ক গভীর এবং দার্শনিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দুটিই মানুষের অবচেতন ও অন্তর্জগত বোঝার চেষ্টা থেকে উৎসারিত তবে প্রয়োগ হয়েছে দুটি ভিন্ন জগতে – ফ্রয়েডের তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানে, আর চেতনাপ্রবাহরীতি সাহিত্যে। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ও সংকট তথা মনোবিকলন চেতনাপ্রবাহের জটিল রূপে উপস্থাপনের এই রীতি শুরু হয় ইংরেজি সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তবে শুধু ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণতত্ত্বের প্রভাবে এর সূচনা, এমন বলা যায় না। কারণ এই দুই আবিষ্কার প্রায় একই সময়ে, ১৯০০ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। মানুষের যুক্তিশাসিত মনই সব নয়, মনের গভীরে ভিন্ন এক জগতেও মানুষ বাস করে এই উপলব্ধির প্রেরণা চেতনাপ্রবাহরীতির প্রতি সাহিত্যিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের ইতিহাসে মার্টিন হাইডেগার, ফ্রিডরিখ নিটশে, সোরেন কিয়ের্কেগার্ড, জ্যাঁ পল সার্ত, কার্ল ইয়াসপের্স-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা একই দলভুক্ত না হলেও তাদের চিন্তা ও তর্কে অস্তিত্ববাদী দর্শনের যে রূপরেখা গড়ে উঠেছে তার সারকথা হলো– মানুষের অস্তিত্ব (To exist) আগে, সত্তা (To live) পরে বিচার্য। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে অস্তিত্ব এবং সত্তার ভিন্নতা নিয়ে মতভেদ নেই। ব্যক্তি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ন, স্বার্থসংরক্ষণ, চিন্তাচেতনা ও জীবনের সমস্যাসহ তার অস্তিত্বের প্রশ্নকেই অস্তিত্ববাদীরা সবার আগে গুরুত্ব দেয়। জীবন অসম্ভাব্য বলেই পদে পদে মানুষকে কষ্ট-সংকট-বিপদে পড়তে হয়। আবার বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ বিষয়ে অস্তিত্ববাদের অন্যতম দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ডের যুক্তি–

> ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করে সংকটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। জীবন তার কাছে হয়/নয় রূপে সংকটজনকভাবে প্রতিভাত হয়। সর্বক্ষণ সে সংকটের মুখোমুখি হয়, তাকে এপথ কিংবা ওপথ গ্রহণ করতেই হয়। সংকটের মোকাবেলাতেই ব্যক্তি তার অস্তিত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং সক্ষম হয় তাকে উপলব্ধি করতে।... এভাবে সচেতন হওয়া মানুষ অস্তিত্ববান হয় তখনই যখন সে এমত পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।[৯]

আস্তিক বা নাস্তিক উভয় দলের অস্তিত্ববাদীরাই মানুষের স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'বস্তুতপক্ষে 'অস্তিত্ব' 'আত্মিকতা' ও 'স্বাধীনতা' – এ তিনটিই হলো অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'[১০] সার্তের মতে, 'অদৃষ্ট বলতে কিছু নেই। মানুষ স্বাধীন এবং মানুষ মানেই স্বাধীনতা।'[১১] তাই ব্যক্তি মানুষ নিজের কর্তব্যের জন্যে, স্বরূপের জন্যে এবং নিজের অস্তিত্বের জন্যে দায়ী। মানুষের নিজের মূল্য নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়। 'সে নিজেকে নিজে যা মনে করে, যেভাবে গড়ে তোলে সে আসলে তা-ই।'[১২] এক্ষেত্রে কোনো শাস্ত্রীয় কর্তৃপক্ষকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়ার বিরুদ্ধে অস্তিত্ববাদীরা সোচ্চার। অস্তিত্ববাদী মানুষ কোনো অমূর্ত মানুষ নয় বরং বাস্তব ব্যক্তিমানুষই তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করার জন্য একমাত্র অস্ত্র। ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা তখনই স্পষ্ট হয় যখন সে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে পারে, মানবপ্রকৃতির মূল কথা হলো স্বাধীনভাবে নির্বাচন। তাঁর বাস্তব অবস্থা ও ভবিষ্যৎ স্বীয় নির্বাচনের ফল। সার্তের মতে, 'মানুষের ইচ্ছা যদি পরিবেশের অধীন হতো তবে তার ওপর কোনো নৈতিক দায়িত্ব আরোপ করা যেত না। সে স্বাধীন বলে তার কাজের নৈতিক বিচার সম্ভব।'[১৩]

মানুষের জীবনের দুর্বল দিক হলো– দুঃখ, ভয়, একাকিত্ব, উৎকণ্ঠা, অপরাধপ্রবণতা, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, হতাশা ও মৃত্যু। জীবনের অর্থহীনতার উপলব্ধি থেকে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের জন্ম হয়, যা মানুষকে নিদারুণ মনস্তাপে ও হতাশায় ডুবিয়ে দেয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তাকে আশাবাদী এবং অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়। সবকিছুকে অস্বীকার করার জন্য তাকে হতে হয় অঙ্গীকারাবদ্ধ, তবেই সে সংকট থেকে মুক্ত হতে পারে। অস্তিত্ববাদী দর্শনে শূন্যতা [Nothingness] অর্থের তিনটি স্তর আছে : যৌক্তিক সম্পর্ক, কিংবা আহরিত সম্পর্ক অথবা মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক। তন্মধ্যে তৃতীয় স্তরে শূন্যতা ক্রম ব্যর্থতা, ক্লান্তি, আতংক ও যন্ত্রণার মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত।[১৪] শূন্যতা আত্মোপলব্ধির সহায়ক হয়ে অস্তিত্বের বোধ জাগায়। এর সদর্থক দিক হলো, মানুষকে নতুনভাবে অস্তিত্বসচেতন করে তোলা। মানুষ একবারই তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে না, বারবার তাকে এই প্রমাণ দিয়ে যেতে হয়। অস্তিত্বের অসঙ্গতি (Absurdity), নিরর্থকতা [Meaninglessness] এবং মৃত্যু নিয়ে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ তাদের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নির্বাচনের স্বাধীনতাই ব্যক্তিকে অস্তিত্ববান করে। এই স্বাধীনতা ছাড়া অস্তিত্ব নিরর্থক। এমনকি আস্তিক্যবাদীরাও মনে করেন, যেহেতু ঈশ্বরকে নির্বাচনের স্বাধীনতা মানুষের আছে, তাই ঈশ্বরও মানুষের মধ্যেই প্রকাশিত। ফলে আস্তিক বা নাস্তিক উভয় অস্তিত্ববাদীদের মতেই মানব-মর্যাদার প্রধান স্তম্ভ হলো স্বাধীনতা। সার্তের অস্তিত্ববাদে, ব্যর্থতা ও বিনাশের পরিণতি মৃত্যু।

উপরের আলোচনায় অস্তিত্ববাদী দর্শনের কয়েকটি প্রত্যয় ও ধারণাকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। কায়েস আহমেদের গল্পে বিষয়গুলি পরীক্ষা করা যেতে পারে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির প্রবেশ। সমসময়ের তরুণ লেখক কায়েস আহমেদকে এই রীতি প্রভাবিত করে থাকবে এটাই স্বাভাবিক, বিশেষত তিনি

নিজেই যখন এক অন্তর্মুখী নিভৃতচারী স্বভাবের মানুষ। কিন্তু কায়েস চৈতন্যপ্রবাহরীতি বা মনোবিকলনধর্মী গল্প– কোনোটাতেই অখণ্ড আস্থা রাখেননি। ক্রমাগত নতুন রীতি ও মানুষকে পরীক্ষা করতে অভ্যস্ত কায়েসের পক্ষে একই বৃত্তে আবদ্ধ থাকা কঠিন। সাধারণত চেতনাপ্রবাহরীতিতে লেখক চরিত্রের মনের গভীরে গিয়ে তার ভাবনার এলোমেলো, সংলাপবিহীন, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাপ্রবাহ ভাষায় ধরার চেষ্টা করেন। এই চিন্তাপ্রবাহ প্রায়ই চেতন-অবচেতনের প্রভেদ রক্ষা করে না, উল্লম্ফনধর্মী যুক্তিশৃঙ্খলাহীন চিন্তায় পরিণত হয়। কায়েসের গল্পে এমন চরিত্র ও চিন্তাস্রোত দুর্লভ নয়; তবে তা উচ্চকিত হয় না, কারণ কায়েসের চরিত্রগুলি বস্তুপৃথিবীর ঘটনাসংকুল বাস্তবতায় গ্রথিত। বরং তার গল্পের চরিত্রচিত্রণে অস্তিত্ববাদী চেতনা যতটা প্রবল, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ততটা নয় বলেই প্রতিভাত হয়। কায়েস আহমেদ সম্পর্কে দুজন সমালোচকের মন্তব্য এই প্রতিপাদ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। 'কায়েস আহমেদ ও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা' প্রবন্ধে কথাসাহিত্যিক শওকত আলী লিখেছেন–

> কায়েস আহমেদের রচনার সম্পূর্ণটাই জীবনের কথা। কোন জীবন?..... যে জীবন এদেশের অধিকাংশ মানুষ যাপন করে, যে জীবনযাপনের প্রক্রিয়ায় মানুষ অনবরত মার খায়। শোষিত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং মাথা নিচু করতে করতে প্রায় মাটিতে নাকমুখ ঘষটাতে ঘষটাতে নিজ অস্তিত্বের পরিচয়টুকু পর্যন্ত লুপ্ত করে দেয়। ঐ মার খাওয়া এবং ক্রমাগত ন্যুব্জ হতে থাকা জীবনের চেহারাটিকে কায়েস ভালোমানুষী আর ভদ্দরলোকী আবরণটিকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে দেখিয়ে দেন। অনিবার্যভাবে ক্ষয়ে যাওয়া মধ্যবিত্তের শ্রমজীবী স্তরে নেমে যাওয়ার কষ্ট, বেদনা ও গুমরানো হাহাকারকে তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় পরিষ্কারভাবে আমাদের শুনিয়ে দেন।[১৫]

মানুষ নিয়ে কায়েসের জিজ্ঞাসার কথা বারবার স্মরণ করেছেন আরেক কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস:

> নিজের এখনকার সত্তার মতো নিজের একালে ও নিজের সেকালে খোঁড়াখুঁড়ি করা হল তাঁর অনুসন্ধানের পদ্ধতি। মানুষ নিয়ে যে-জিজ্ঞাসা তাঁকে এক লেখা থেকে আরেক লেখায়, এক রীতি থেকে আরেক রীতিতে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল তার জবাব খোঁজার জন্য নিজেকে উলটেপালটে দেখতেও তিনি পেছপা হননি।.... জীবনকে বোঝার জন্য, মানুষের রহস্য জানার জন্য যে-অনুসন্ধান-প্রক্রিয়া চালান তার প্রধান মিডিয়াম ছিলেন তিনি নিজে।[১৬]

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, শওকত আলীর বর্ণনায় বিধৃত যে-মানুষ কায়েস উপস্থাপন করেন– ক্রমাগত পরাজয়ে কুঁজো হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠদেশ, শ্রীহীন অবয়ব, সীমাহীন দারিদ্র্য-দৈন্যে টিকে থাকা– এই 'খোঁড়াখুঁড়ি', যা ইলিয়াসও দেখতে পান, তার কারণ কি কায়েস নিজে? কিসের সন্ধান করেন কায়েস?– নিজের একাল-সেকাল? দীননাথ সেন রোডের ছোট্ট ফ্ল্যাটে উদ্‌বন্ধনে কায়েসের স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণের পর ইলিয়াস লেখেন– 'মানুষের জীবনের রহস্য খুঁজতে খুঁজতে নিজের জীবনের অনুসন্ধানের চরম জবাবটি পাওয়ার জন্যই কি মরিবার হল তাঁর সাধ? মানুষের রহস্যময়তা ভেদ করতে না-পেরে, তিনি কি পরম জিজ্ঞাসাটি ছুঁড়ে দিলেন প্রকৃতির দিকে?'[১৭]– ইলিয়াসের এই জিজ্ঞাসা যথার্থ, তবে তার আগেই কায়েস এই প্রশ্নের উত্তর রেখে যান 'জীবন' গল্পের রুনু চরিত্রের ডায়েরিতে–

> কী বিস্ময়, কী রোমাঞ্চকর এই বাঁচিয়া থাকা। পৃথিবী কত পুরাতন হইয়া গেল, তবু প্রকৃতি এখনও নবীন, এখনও সে প্রথম দিনের মতো টাটকা– লক্ষ কোটি বছরের প্রাচীন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত এতটুকু ম্লান হইল না।... ... তেমনি মানুষের প্রবাহ– কত উত্থান-পতন, কত ধ্বংস-বিপর্যয়,

> কত রক্তপাত, কত বেদনার অশ্রু, তবু মানুষের মস্তক অবনত হইল না। কী সে শক্তি? যন্ত্রণায় কাতর মুমুর্ষু যে, মৃত্যু পথযাত্রী সে-ও প্রতি মুহূর্তে বাঁচিবার অদম্য ইচ্ছা লইয়া জাগিয়া আছে। বিফল, ব্যর্থ, বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তি কিংবা যুগ যুগান্তের মার খাওয়া সমষ্টি– দারুণ দুঃখ, অপমান, প্রতি মুহূর্তের গ্লানির মধ্যেও দাঁতে দাঁত চাপিয়া হুমড়ি খাইয়া, বুক হিঁচড়াইয়া প্রাণপণ বাঁচিয়া থাকিবার অকথ্য শ্রম করিতেছে কিংবা কখনো সে প্রতিবাদী হাত উর্ধ্বে তুলিয়া নিজের অহঙ্কারী অস্তিত্ব ঘোষণা করে– ইহার মূলে কি ঐ প্রকৃতি? প্রতি দিনের নব সূর্যোদয়? সবুজ নিসর্গ? নদীর উদাসীন প্রবাহ?– তাহার অবচেতনার প্রাণরস জোগায়?[১৮]

জীবনের প্রতি তীব্র ভালোবাসায় সিক্ত, এই দিনপঞ্জির লেখক রুণুর আত্মহত্যা, বন্ধুদের কাছে এক রহস্য। বেঁচে থাকার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেও মানুষ কেন আত্মবিনাশী হয়, তার জবাব রুণুর বাল্যবন্ধু তথা গল্পকথকের জবানিতে দিয়েছেন কায়েস–

> বেঁচে থাকা এক ধরনের 'তীব্র, ঝাঁঝালো অসহ্য আনন্দ।' রুণু সেই অসহ্য আনন্দের ভার সইতে পারেনি; অতি আনন্দে মানুষের চোখে তো পানিও আসে, রুণুর সুইসাইডও সম্ভবত সেই আনন্দের আর এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ।... বস্তুত আমরা কেউ কাউকে চিনি না।[১৯]

কায়েসের গল্পের কোনো চরিত্রের মৃত্যু 'জীবন' গল্পের রুণুর মতো গভীর রহস্যময় নয়। রুণু যেন কায়েসের আত্মখনন। কায়েস তার অনুসন্ধানী চোখে খনন করতে থাকেন মানুষের বিশিষ্ট-অস্তিত্ব [Existence] ও প্রকৃত-সত্তার [Essence] ঠিকানা, যেখানে নিকটতম মানুষও অপরিচিতের আড়ালে থেকে যায়। হত্যা-আত্মহত্যা-আত্মবিনাশ যেভাবেই রূপ দেওয়া হোক-না-কেন, মৃত্যু ও 'মৃত্যুর মোহনীয় সম্ভাবনা'[২০] কায়েসের গল্পে নানাভাবে, বারবার উপস্থাপিত হয়, কিন্তু তা রুণুর 'অসহ্য আনন্দের' বহিঃপ্রকাশের মধ্যে নয়– জীবনের সম্ভাবনার মধ্যে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কায়েসের গল্পে আমরা অনেকরকম মৃত্যু দেখি– দেশভাগের রাজনৈতিক সহিংসতা ও দাঙ্গায় মৃত্যু [*নির্বাসিত একজন*], মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক সংঘাতে অজানাসংখ্যক মৃত্যু [*জগদ্দল*, 'নচিকেতাগণ', 'শেষ বাজী', 'আসন্ন'], শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতিতে মৃত্যু ['মহাকালের খাঁড়া', 'দুই গায়কের গল্প'], সর্পদংশনে বা ট্রেনে কাটা পড়ে অপঘাতে মৃত্যু ['নিরাশ্রিত অগ্নি', 'অন্তর্লীন চখাচখী', 'খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং', 'বন্দী দুঃসময়', 'গগনের চিকিৎসা তৎপরতা'], স্বেচ্ছামৃত্যু ['জীবন', 'প্রতারক জোস্না', *কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ*], ধর্ষণের পর হত্যা বা হত্যাচেষ্টা ['গন্তব্য', 'অন্ধ তীরন্দাজ'], মৃত্যুর আবহ ['যাত্রা', 'পরাণ', 'নৈঃশব্দ্যের ভার']– এভাবে মৃত্যুময় হয়ে ওঠে কায়েসের ক্যানভাস। তাই কায়েসের গল্পের অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসাগুলি মৃত্যুর বহুরূপতার মধ্যে স্থান পেয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

৩.

কায়েস আহমেদের লক্ষ্য মানুষ– উপলক্ষ ঐ মানুষগুলির যাপিত জীবন। জাতীয় রাজনীতি, আন্দোলন-সংগ্রামের উত্তাপ-উত্তেজনার রূপায়ণ তাঁর লক্ষ্য নয়। তথাপি যে-সময়ের কোলে মানুষগুলি আশ্রিত তার অস্থিরতা-অবক্ষয়-অনিশ্চয়তা অনিবার্যভাবে মিশে থাকে মানুষগুলির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়। সে-সূত্রে কাহিনিতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে আভাসিত হয় দাঙ্গা-দেশভাগ-দুর্ভিক্ষ-মুক্তিযুদ্ধ-যুদ্ধোত্তর অস্থিরতা ও রাজনৈতিক সংকট; আভাস মাত্র– উদ্ভাস নয়। সাংকেতিক দৃশ্য বা শব্দে, ঘটনার নিরুচ্ছ্বাস, অনাড়ম্বর বর্ণনায় সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা বিধৃত হয়। প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ মানুষগুলির কাছে যে-কোনো পরিস্থিতির মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম

চালিয়ে যাওয়ার যে বাধ্যবাধকতা তাতে রাষ্ট্র-রাজনীতি-ক্ষমতার হিসেবনিকেশ গৌণ– অথচ এড়িয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই। চায়ের দোকানে আড্ডায়, শুঁড়িখানার বিবাদে, কলতলার ঝগড়ায়, চাকুরির সন্ধানে, প্রেমের ফাঁদে বা আটপৌরে সম্পর্কের নিরুত্তাপ সংলাপের মধ্যে সহজেই ঢুকে পড়ে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আবার সহজেই তা হারিয়ে যায়। বলা যায় 'তিনি গল্পের শরীরে এদেশের ইতিহাস ও সময় এবং সময়েতিহাস শাসিত মানুষকে ধরতে চেয়েছেন।'[২১] রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোর সাথে, তলানিতে থাকা এই মানুষগুলির কোনো প্রকার সংযোগ বা আত্মীয়তা নেই তবু তাদের মুক্তি নেই সেই আগুনের আঁচ থেকে। কায়েস কোথাও আগুনের উৎস বা শিখা দেখান না, কিন্তু সে আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে থাকে তার গল্পে-উপন্যাসে। কায়েসের গল্পের মানুষগুলো হয় উদ্বাস্তু, না-হয় নির্বাসিত; ভেতরে-বাইরে নিঃস্ব; জীবন থেকে উন্মুলিত। দেশহারা উদ্বাস্তু নয়, মনোজগতে নিরাশ্রয়ী। দেশ থেকেও যারা নিরাশ্রয়ী তাদের কথাই কায়েস প্রাধান্য দেন। যে মানুষগুলি রাজনীতির কিছু না-বুঝে, না-শুনে, দেশ থাকা সত্ত্বেও 'রিফ্যুজি' হয় তাদের অস্তিত্বসংকট, গল্পের অন্তর্বয়নে মৃত্যুর বহুরূপতা এবং মানুষের অস্তিত্বসংগ্রামে মিশে থাকা প্রতিবাদী, অপরাজেয় সত্তার জাগরণ কায়েস আহমেদের কথাসাহিত্যে, গল্প-উপন্যাস উভয়ক্ষেত্রে, বিশেষ গুরুত্ববহ। মানুষগুলি বিত্তশালী বা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা একেবারে বিত্তহীন, প্রান্তিক বা হতদরিদ্র যা-ই হোক-না কেন কায়েস আহমেদ তাদের যাপিত জীবনের ভেঙে-চুরে যাওয়া, পরিণামহীন, নিরুদ্যম, ভারাক্রান্ত অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সংকটগুলি রূপায়িত করেন। চরিত্রগুলি বারবার পরাজিত হয়, নুয়ে পড়ে, শুয়ে পড়ে, হেরে যায়, মরে যায়। তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকে অথবা বিলীন হয় মৃত্যুতে– দুইয়ের মধ্যেই কায়েসের অনুসন্ধানী চোখ পড়ে। কয়েকটি গল্পের আলোচনাসূত্রে এই অভিমতের যাথার্থ্য নিরূপণ করতে পারি।

'নিরাশ্রিত অগ্নি'র 'ফজর আলী গরিবের গরিব, ছোটলোকের ছোটলোক'[২২] এই পরিচয় দেওয়ার পর একজন মানুষের সামাজিক বা শ্রেণি-অবস্থানের আর কোনো বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এমনকি নাপিতও অমন কুদর্শন, ভাঙাচোরা দেহের মানুষের দাড়ি কাটতে চায় না, এ কথা জানানোর পর ফজর আলী সম্পর্কে খানিকটা করুণা বা দয়া জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। আত্মসম্মান বা মর্যাদার কোনো উপলব্ধি ফজর আলীর মনে কখনও জাগে না, এই বোধই তার গড়ে ওঠেনি কখনও। কায়েস আহমেদ পাঠকের জন্য এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> নিজের দুঃখ কষ্টের কথা কাউকে কখনও বলে না ফজর আলী। তার মানে এই নয় যে, সে খুব আত্মমর্যাদাবান,– নিজের কষ্টকে অনুভব করবার জন্যে মনের যে সৌখিনতা থাকবার দরকার তা তার নেই। তার কাছে যে কোন আঘাত বেদনার নয়, সমস্যার।[২৩]

কিন্তু বংশপরম্পরায় 'গরিবের গরিব' ফজর আলীর মধ্যেও মহাপুরুষের বীজ ঢেলে দিয়েছেন কায়েস। ফজর আলীর আচরণে সেই ইঙ্গিত নিতান্তই কৌতুক বলে মনে হয়েছিল গল্পের শুরুতে। মহাপুরুষ হওয়া তো দূরের কথা, 'ছোটলোকের ছোটলোক' ফজর আলী নিজকে মহাপুরুষ ভাবতেও যে পারে সেটাই অবাক করার মতো। কিন্তু প্রাত্যহিক এক সামান্য ঘটনায় ফজর আলীর মনোজগতে ঝড় বয়ে যায়। সেই ঝড়ে সে ফিরে পায় তার মানব-অস্তিত্বের সার। 'নিজের মাগ-ছেলেকে দু'বেলা দু'মুটো খেতে দেবার মুরোদ নেই যে মানুষের তার আবার সংসার করার শখ ক্যানো?'[২৪] –স্ত্রী জমিরনের এমন কথা তার আত্মসম্মানে আঘাত হানে। টানাটানির সংসারে এমন কত কথাই হয়, কিন্তু এমন একটা গতানুগতিক বচসাই ফজর আলীকে নিজের মুখোমুখি দাঁড়

করায়। জেগে ওঠে তার ব্যক্তিসত্তা। বংশপরম্পরায় পাওয়া দারিদ্র্য, দলিত-মথিত ও মূল্যহীন পরিচয়ের আবরণ উড়ে গিয়ে ফজর আলীর মনে হয়– এতটা অক্ষম, অপদার্থ সে নয়। তার যা অভাব-অনটন-অক্ষমতা সেটা পিতৃপুরুষের দায়, তথাপি দশ বছর ধরে আধপেটা খেয়ে না-খেয়ে সংসারের সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছে সে সুতরাং এই অপবাদ তার প্রাপ্য নয়। ফজর আলী মহাপুরুষ নয়, কিন্তু মানুষের মহত্তম এক অস্তিত্ববাদী সত্তায় তার উত্তরণ ঘটে। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার মন। রেনে দেকার্তের ' আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি' মীমাংসার প্রতিধ্বনি করে আলবেয়া কামু বলেছিলেন- 'আমি বিদ্রোহী বলেই আমি অস্তিত্বশীল'।[২৫] মানুষের অপরাজেয় অস্তিত্বের অন্যতম শক্তি তার অহং ও দ্রোহ, দুয়ের মিলিত স্রোত বয়ে যায় ফজর আলীর গায়ে। মানুষের নিজের কৃতকর্মের দায় তার নিজেরই– একথা অস্তিত্ববাদীদের, কিন্তু ফজর আলী তাতে পূর্বপুরুষের দায়ও দেখে। এভাবে শ্রেণিসম্পর্কের ঐতিহাসিক সূত্র কায়েস তুলে দেন ফজর আলীর মুখে। তীব্র গরমে কবরস্থানে গিয়ে বাবার কবর খুঁজতে থাকে ফজর আলী, যেন পূর্বপুরুষের কাছে জবাবদিহি চায় সে। হঠাৎ সামনে পড়ে যায় ফণাতোলা বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ। দুপুরের তীব্র ঝাঁঝালো সূর্যরশ্মি মাথায়, রক্তে জেগে ওঠা প্রশ্ন– 'তার কী দোষ?' এই দুয়ে মিলে নগণ্য ফজর আলীকে অমিত সাহসী মহাপুরুষে পরিণত করে। চন্দ্রবোড়াই যেন তার প্রতিপক্ষ। তার সমস্ত নিঃস্বতা-ক্ষুদ্রতা, স্ত্রীর কটুবাক্য, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত মানবেতর জীবনযাপনের অনপনেয় অভিশাপ– সবকিছু থেকে মুক্তির জন্য ফজর আলী বাঁশ হাতে চন্দ্রবোড়ার মুখোমুখি হয়। বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে চন্দ্রবোড়ার মাথা টুকরো টুকরো করে ফেলে বাঁশের আঘাতে। কিন্তু তার আগেই চন্দ্রবোড়া বিষ ঢেলে দেয় ফজর আলীর পায়ে। দৃশ্যত সর্পদংশনে ফজর আলীর মৃত্যু হয়, কিন্তু তার আগে জীবন সম্পর্কে মুহূর্তের উপলব্ধি তাকে সত্তান্বেষী মানুষে পরিণত করে। ফজর আলীর 'দুচোখে কোথা থেকে যে এতো ঘৃণা এবং ক্রোধ জমা হতে থাকে কে জানে।'[২৬] এই ঘৃণা ও ক্রোধ কার বিরুদ্ধে তা সহজে অনুমেয়। সমাপ্তিতে কায়েস জানিয়েছেন মৃত সাপের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে ফজর আলী। অর্থাৎ, চন্দ্রবোড়ার মৃত্যু হয়েছে ফজর আলীর নয়; দৃশ্যত সে সাপের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। সমাজের একেবারে নগণ্য মানুষও অস্তিত্বের সারার্থ রক্ষায় দ্রোহী হয়ে উঠতে পারে– ফজর আলী তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

'দুই গায়কের গল্প'-তে দুই বন্ধু অন্ধ জগন্নাথ বাড়ুই ও হরিদাস ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষা করে। তাদের সামাজিক অবস্থানও ফজর আলীর চেয়ে শ্রেয়তর নয়। কায়েসের ভাষায়, 'জগন্নাথের বসন্তে খাওয়া মুখমণ্ডলের সম্মিলিত অভিব্যক্তিটি বীভৎস' তবে তার মধ্যে খানিকটা অসহায়ত্বও থাকে; সে বদমেজাজি এবং রাজনীতি-বিদ্বেষী। অন্যদিকে 'কালো গলা লম্বা, ল্যাকপেকে' হরিদাসকে কেউ কখনও গায়ে জামা দিতে দেখেনি। তার মতো মানুষের ভালোবাসায় কোনো সৌখিনতা নেই, আছে জান্তব কামনা ও উদাসীনতা। রাজনীতি, ধনী-গরিব এসব তাদের মাথায় ঢোকে না, 'ইসব হলো ভদ্‌দোল্লোকের ব্যাপার'।[২৭] জগন্নাথের বদ-অভ্যাস আছে পতিতালয়ে যাওয়ার, এটা জানে হরিদাস। অন্ধ জগন্নাথের পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে একদিন সে দেখে ফেলে জনাই পতিতালয়ে; বিষয়টি জগাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলেও জানানো হয়নি। ঘটনাক্রমে নকশালদের সাথে পুলিশের সংঘাতের মাঝখানে পড়ে যায় জগন্নাথ ও হরিদাস। আকস্মিকভাবে হরিদাস গুলিতে আহত হয়, মৃত্যুর আগে জগন্নাথকে বলে যায় চরম সত্য কথাটি– 'জগা, তুই আর জনাই বেশ্যাবাড়ি আসিস নি.....ওখানে তোর বউকে দেকনু আজ।'[২৮] মুহূর্তে 'ভাঙা মূর্তির মতো' হতভম্ব জগন্নাথ, ক্ষুব্ধ জগন্নাথ হারমোনিয়াম শূন্যে তুলে নকশাল ও পুলিশের সংঘর্ষের দিকে তেড়ে যায়।

তার শত্রু কে এতদিন সে জানত না, এবার চিনে ফেলে। চক্ষুষ্মান হরিদাস চোখ খুলে দেয় অন্ধ জগন্নাথের। কায়েস আহমেদ অন্ধ জগাইয়ের দ্রোহী-অবয়বকে বিশেষ পরিচর্যায় হাজির করেন–

> হারমোনিয়ামটাকে হ্যামারের মতো দুহাতে তুলে ধরে ক্ষ্যাপা মোষের মতো ছুটে যায় পুলিশের জিপের দিকে, তার শরীর শূন্যে একটি মোচড় খায়। ধনুকের মতো ব্যাঁকে; তারপর; যেনো ধনুক থেকে তীর ছুটে গেলো, জগন্নাথ সমস্ত শরীর দিয়ে পৃথিবীকে বিদ্ধ করে।[২৯]

হরিদাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জগন্নাথের আত্মজাগরণ ঘটে। ফজর আলী শত্রুকে চিনতে পারেনি কিন্তু জগন্নাথ পেরেছে। অন্ধ জগন্নাথের পরম নির্ভরতা হরিদাসের মৃত্যু তাকে অন্তরে-বাহিরে নিঃস্ব করে দেয়। বেঁটে-খাটো এই মানুষটার মধ্যে পৃথিবীকে বিদ্ধ করার মতো টানটান ভঙ্গি এনে কায়েস আহমেদ প্রকারান্তরে অস্তিত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'নিয়ামত আলীর জাগরণ' গল্পের নিয়ামত মদ্যপ, বিকারগ্রস্ত, সকলের বিদ্রুপের পাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মায় জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার আহত হওয়া, সৈনিক হিসেবে পেনশন পাওয়া এবং পিঠের ওপর বড়সড় একটা ক্ষত এসব ঘটনা অতিকথনে মানুষের কাছে গালগল্প ও হাস্যরসের খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ক্ষত এবং পুরনো এক ওভারকোট নিয়ামত তার যৌবনে লড়াই ও সাহসিকতার প্রমাণস্বরূপ যত্নে রাখে। তার পিঠের ক্ষত, বাস্তব অথবা কল্পিত যাই হোক, এ গল্পে প্রতীকী মাত্রা পায়। তার ক্ষুধাতুর, নিঃসঙ্গ, নেশাগ্রস্ত বর্তমান জুড়ে থাকে এক সূক্ষ্ম অহংকার-মোড়া অতীত। কল্পকথার অপবাদ পাওয়া সেই অতীত একদিন হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে। ছিন্নমূল এই আধ-পাগল মানুষটি মল্লিকদের জনমানবহীন বাগানবাড়িতে মাংস রান্না করার মনোবিকারে 'নির্ঝঞ্ঝাটে বার্মা ফ্রন্টে চলে যায়', হাঁড়িতে মাংস তোলে, টগবগিয়ে সেই মাংস রান্না হতে থাকে। কিন্তু তার এই স্বপ্নালু মনোবিকার ছুটে যায় বাইরের গোলাগুলিতে পুলিশের ধরপাকড়ের মধ্যে পড়ে। নকশাল-বিদ্রোহ দমনে পুলিশের অভিযানের মধ্যে নিয়ামতকে সন্দেহবশত ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় সেই 'স্মৃতিজাগানিয়া' ক্ষততে পুলিশের লাঠির খোঁচা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে এক জ্বলজ্বলে বিদ্রোহের শক্তি সঞ্চারিত হয় নিয়ামতের ন্যুজদেহে; তার 'ঊর্ধ্বমুখী হাত দু'টি মুষ্টিবদ্ধ হয়; গ্রীবায় দুই চোয়াল এবং চোখে অখণ্ড শানানো দৃঢ়তা এসে যায়।'[৩০] সে হয়ত প্রতিরোধ গড়তে পারে না, যেহেতু ফজর আলী বা জগন্নাথের মতো তার হাতে, বাঁশ বা হারমোনিয়াম, কিছুই ছিল না– কিন্তু সে পুলিশের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বমি করে তার ঘৃণা ও প্রতিবাদ উগরে দেয়–

> নিয়ামতের ভিতর দুপুরের সেই রাগ ফিরে আসতে থাকে। তীব্র ক্ষিদেয় সেই রাগের ওপর বজ্রের প্রহার চলে। পেছন থেকে আবার রাইফেলের খোঁচা লাগে: 'চল শালা।' নিয়ামতের মাথার ভেতর দুম করে বোমা ফাটে। প্রচণ্ড ঘৃণায় সে ও.সি'র উদ্দেশ্যে কি যেন একটা খিস্তি করার জন্যে মুখ খুলতেই বমি বেরিয়ে আসতে থাকে। শরীরে শৈথিল্য আসে না, সটান দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়ে জ্বল-জ্বলে চোখে ও.সি'র মুখের দিকে তাকিয়ে ওয়াক ওয়াক ক'রে বমি করতে থাকে নিয়ামত আলী।[৩১]

সমাজের কাছে প্রায় অস্তিত্বহীন নিয়ামত আলীর প্রবল উপস্থিতি ঘটে, অস্তিত্বের পরীক্ষায় ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি সে পায় মানুষের কাছে বিদ্রূপে পরিণত হওয়া তার একমাত্র অহং 'যুদ্ধের সৈনিক' পরিচয়ের মধ্যে আর সেই 'পুরনো ক্ষতে' পুলিশের খোঁচায়; এ যেন তার অহং-এ আঘাত। নিয়ামত, ফজর আলী বা জগন্নাথ প্রত্যেকেই পরাভূত, বিধ্বস্ত মানবীয় সত্তার উদাহরণ। কিন্তু তাদের অজান্তেই তাদের অস্তিত্বের নিভৃত অন্দরে আত্মমর্যাদার একটি রক্ষাকবচ তৈরি ছিল যা

পারিপার্শ্বিকের প্ররোচনায় বিশেষ মুহূর্তে মানবীয় অস্তিত্বের সারসত্তা উপলব্ধিতে সহায়ক হয়েছিল বলেই তারা আর নগণ্য হয়ে থাকেনি।

৪.

মৃত্যু এক ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত হয় 'অন্ধ তীরন্দাজ' ও 'গন্তব্য' গল্পে। 'অন্ধ তীরন্দাজে' হত্যায় ব্যর্থ হয়ে ঘাতকের অস্তিত্বজিজ্ঞাসা এবং 'গন্তব্যে' হত্যাকাণ্ডের পর ঘাতকের মনস্তত্ত্বে ঘটে যাওয়া অস্তিত্ব-অনস্তিত্বসংকট– দুটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষা। যশোরের মনিরামপুরের একটি নৃগোষ্ঠীর অন্তর্কলহের গল্প 'অন্ধ তীরন্দাজ'। বলাই মাইতির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাড়া করা ঘাতক নিতাই, পচা, সগু, নাড়ু কয়েকদিন ধরে রেললাইনের ধারে ওঁত পাতে বিজয় ঘড়ুকে হত্যার উদ্দেশ্যে। শুধু পেটের তাগিদে তারা এই খুন করতে যায়। কিন্তু কয়েক রাত ধরে উজ্জ্বল চাঁদের আলোর কারণে প্রয়োজনীয় অন্ধকার না পেয়ে তারা হতাশ; চন্দ্রালোকিত জোস্নার ওপর বিরক্ত। শেষ পর্যন্ত খুন করতে না-পেরে ঘাতক সগুর মর্মস্পর্শী আর্তনাদ – 'আমাকে মেরে ফেল আল্লার কসম। তোরা আমাকে এখানে খুন ক'রে রেকে যা, আর বাঁচতে ভাল্লাগেনা। আমাকে মেরে ফেল্ পচা, তোর পায়ে পড়ি...।'[৩২] সচকিত করে আমাদের। এ যেন অন্যের মৃত্যু নিশ্চিত করতে এসে নিজের মৃত্যু কামনার এক ক্রুর, অভাবিত বাস্তবতা। সগুর আর্তনাদ অনুশোচনার নয়; আত্মোপলব্ধিরও নয়। বেঁচে থাকার নিকৃষ্টতম উপায়ও যখন হাতছাড়া হয়, তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে নিমজ্জমান সগুর নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণের বা পরাজয়ের ক্রন্দন এক অসীম শূন্যতায় নিজকে আবিষ্কার করার সামিল। মৃত্যু এখানে ঘটনা নয়, অণুঘটক; ঘাতকই শেষপর্যন্ত ঘায়েল হয়, শিকারী হয়ে যায় শিকার।

'গন্তব্য' গল্পটি কায়েস আহমেদের অন্যতম সফল সৃষ্টি। গল্পের কাহিনি বিন্যাসে, ভাষার বুননে, চরিত্রের মনোজগতের সাথে পারিপার্শ্বিকের ব্যঞ্জনাধর্মী রূপায়ণে, দৃশ্যের বহুস্তরিক পরিচর্যায় 'গন্তব্য' কায়েসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'কাল বেলা তিনটে থেকে নেপাল পড়ে আছে ওখানে।'- এমন অপমৃত্যুর দৃশ্য দিয়ে গল্প শুরু হয় এবং এই মৃত্যুর আবহ চলতেই থাকে গল্প জুড়ে। তাঁতের কাজ চলে যাওয়া, কোথাও কাজ জোগাড় করতে না পারা, পাওনা বেতনও না পাওয়া– সব মিলে শামু নামের এক তরুণ বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার আতঙ্কে জর্জরিত। ফজর আলীর মতো, পিতৃপুরুষের ওপরও সমান ক্ষোভ তার–

> না এক ছটাক চাষের জমি না কিছু, ইঁদুরের গর্তের মতন মাটির একখানা ঘর, চালের পুরোনো খড় ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে, সামনে বর্ষা, ঘর-বার সমান হয়ে যাবে, আর তার কাছে পয়সা নেই– ঘরে মাগ ছেলে, পেটে ক্ষিদে– কুকুরের মতন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে ফেরা– এই তো।[৩৩]

শামু এতটাই বিপর্যস্ত যে, 'জুলাই মাসের চিড়বিড়ে রোদে হাঁটতে হাঁটতে শামু নিজের ওপরই ক্ষেপে ওঠে, কী দরকার ছিলো তার জন্মাবার।'[৩৪] একদিকে ভাতের ক্ষিদে, অন্যদিকে ডুরে শাড়ি পরা বছর তেরোর মেয়ে দেখে তার ভেতরে হাহাকার এবং ক্ষিদে উভয়ই রোদের মতোই চিড়বিড়িয়ে ওঠে– 'শালা দুনিয়ার যতো ভালো ভালো মেয়েমানুষ সব অন্য লোকের দখলে।– তার সঙ্গে চাকরিহীন ভবিষ্যৎ, রেল লাইনে কাটা পড়াম ঘেঁটু মালের ছেলে, ... এইসব মারমুখী ভাবনা পাওনাদার কাবলীর মতো 'সালে হারামখোর' বলে লাঠি উঁচিয়ে'[৩৫] তেড়ে আসে, তাই বিরক্ত হয়ে গ্রামের নির্জন এক পুকুরপাড়ে সে যখন বসে আছে, সেসময় সেই পরিবেশের প্ররোচনায় বা উদ্দীপনায় পাতা কুড়াতে থাকা বিধবা কামিনীর দিকে দৃষ্টি পড়ে শামুর। কামিনীকে ধর্ষণ করে সে।

ধর্ষণ শেষে কামিনীর ক্রোধের থুতু পড়ে তার মুখে। ক্রোধোন্মত্ত শামু গলা চেপে হত্যা কামিনীকে। অতঃপর সেই পরিতৃপ্তি-ভয়-বৈকল্য নিয়ে ফিরে আসে সংসারে। কিন্তু কোন্ সংসার? কোন্ সমাজ? ট্রেনে কাটা পড়া লাশ সৎকারের অধিকারও তাদের নেই, এদিকে মায়ের কান্না দিনভর গ্রামের পরিবেশ ভারি করে তোলে। এমন করুণ অবস্থার মধ্যে কায়েস আহমেদ একের পর এক নিম্নবৃত্তজীবীদের কর্মহীনতা ও অনটনের খবর দিতে থাকেন। ক্ষুধা, কর্মহীনতা, ট্রেনে কাটা-পড়া ছোকরার খণ্ডিত দেহ, 'কালো-সরু-উঁচুদাঁত-চ্যাপ্টানাক' অসুন্দর স্ত্রী, নানারকম ক্ষ্যাপা ভাবনা– সব মিলে শামুর শরীরে যে অবদমিত ক্রোধ ও হতাশা তীব্র হয়ে ওঠে তারই পাশবিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে কামিনী-ধর্ষণ ও হত্যার মধ্য দিয়ে। এই জিঘাংসা ও পাশবিক প্রবৃত্তির হিংস্র বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রকৃতপক্ষে কে, কেন দায়ী তা তর্কসাপেক্ষ। প্রতিবেশের প্ররোচনা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বিবেচ্য–

> ঝাঁ ঝাঁ দুপুর, জুলাই মাসের রোদে নতুন টিনের পাতার মতো চকচকে সাদা থির হয়ে থাকে পুকুরের পানি, বনপালা, ঘাসমাটি থেকে ঝাঁঝালো, চাপা, সোঁদা নোনা গন্ধ পাঁচ তরকারীর মতো মিলেমিশে একটা গন্ধ হয়ে আছে। গাছের মাথায় কাক ডাকছে কোথাও দূরে। এই দুপুর, এই নির্জনতা, এই বনপালা আর গন্ধ শামুকে ভারী সাহসী করে দেয়।'[৩৬]

কায়েসের এই পরিচর্যা মানলে, প্রকৃতি ও প্রতিবেশের প্রশ্রয়েই এমন পাশবিকতা ঘটে। অন্যদিকে অস্তিত্ববাদীরা, বিশেষত সার্ত মনে করেন, মানুষের কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। সুতরাং মানবীয় সত্তা বিসর্জনের সম্পূর্ণ দায় শামুর। অথচ শামু বা ফজর আলী উভয়ই ঘটনার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছে মাত্র। কায়েস আরও সূত্র রেখে যান গল্পে– শামুর শ্রেণি অবস্থানের কারণেই অস্তিত্বের সারসত্তায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না তার পক্ষে। যে বিকৃতি তাকে কামিনী-ধর্ষণে উদ্বুদ্ধ করে তার কারণ লিবিডো নয়, শূন্যতা। অস্তিত্ব হারানোর ভীতিজনিত শূন্যতা, কিন্তু সেখানে থেকে তার মুক্তি ঘটে না। কারণ প্রতিদিনের মতো, পরদিন সকালেও তাকে ক্ষুধা ও জীবিকার সাথে লড়াই শুরু করতে হয়। ভোরের প্রকৃতির নির্মল বাতাস তাকে নতুন করে সেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে। এভাবে বেঁচে থাকার বৃত্ত রচনা করে যায় যেসব মানুষ তাদের জন্য, বোধ করি, 'জীবন' গল্পের রুণুর ডায়েরিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন কায়েস আহমেদ।

কিন্তু ধর্ষণ ও হত্যার পর শামুর মধ্যে যতখানি ভাবান্তর দেখা যায় তা অপরাধজাত ভীতি। কামিনীকে খুনের পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে তার দুপায়ে। শামুর সন্ত্রস্ত মন ও বিধ্বস্ত শরীরী অভিব্যক্তি কায়েস আহমেদের বর্ণনায় ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। তার মনোজগতে অস্থিরতা দেখি না, আলোড়ন যা হয় তা ভীতিজনিত, অপরাধবোধ থেকে নয়। বাড়িতে গিয়ে তার মনে হয় 'সে যদি পিঁপড়ে হতো, ইঁদুর হতো, কিংবা সাপ। কী সহজেই না তাহলে লুকোনো যেতো নিজেকে।'[৩৭] হয়ত কিছুক্ষণের জন্য শামুর মধ্যে অপরাধবোধ জন্মায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অপরাধবোধ শামু চরিত্রের অন্ধগলিতে কোনো আলোর রেখা দেখায় না। গল্পের শুরু থেকেই সকল অনুষঙ্গ, উদ্দীপনার গন্তব্য ছিল শামুর মধ্যে জায়মান হতাশাকে অস্তিত্বের এক সংকটজনক মুহূর্তে ন্যস্ত করা। কামিনী ধর্ষণ ও হত্যার পর শামুর সংকট ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। নতুন দিনে ভোরের আলোয় নিঃশ্বাস নিতে গেলে আবার সেই ক্ষিদে ফিরে আসে, 'মাথার ভেতর অসংখ্য পেরেক পুঁতে রাখে' কেউ, ভীতি তার থাকে, কিন্তু অনুশোচনা বা আত্মোপলব্ধির সময় কই? শামু এই গল্পে ক্রমাগত প্ররোচিত ও প্রভাবিত হয়েছে প্রতিবেশের ইন্ধনে। তার স্বাধীন সত্তাই প্রশ্নবিদ্ধ। পেটের ক্ষুধা হোক বা যৌনক্ষুধা– কেবল প্রবৃত্তিই তার চালক। অস্তিত্বচেতনার এ এক অন্ধকার দিক। লক্ষণীয় যে– সগু, শামু, ফজর আলী, নিয়ামত, জগন্নাথ সবাই কোনো না কোনো প্রাতিবেশিক প্ররোচনা ও

প্রযোজনায় পরিচালিত হয়েছে। প্রকৃতি-পরিবেশ, সমাজ-নিসর্গ মিলে তাদের অন্তর্সত্তায় এক 'দুর্বিষহ পারিপার্শ্বিকের চাপ, অসহ্য চাপ'[৩৮] তৈরি করে এবং গভীর সংকট ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যায়; সেই দ্বন্দ্বময় মুহূর্তে অস্তিত্বজিজ্ঞাসা হয় প্রবলতর। মানুষ কোন পথ বেছে নেয় তা অনিশ্চিত।

৫.

মৃত্যু নেই কিন্তু অস্তিত্বজিজ্ঞাসা আছে এমন গল্প 'গোপাল কামারের তলোয়ার'। গল্পের গোপাল কামার নাতির বায়না রাখতে 'আলিবর্দি খাঁর তলোয়ার' বানানোয় মগ্ন এবং রোমাঞ্চিত। যে তলোয়ার দিয়ে দেশ থেকে বর্গি তাড়িয়েছিলেন নবাব তেমনই তলোয়ার তার চাই। কিন্তু গোপাল কামারের সংসারে হানা দেওয়া নিঃশব্দ বর্গি– ভোগবাদী নষ্ট সময়ের দাঁত বের করা ভয়াল রূপ সে তাড়াতে পারে না। সময়ের কাছে পরিত্যাজ্য মূল্যবোধের ধারক হয়ে থাকা সুখকর নয়– এটা বোঝে গোপাল, তাই সে-ও আপোষ করাই শ্রেয় মনে করে। বরং নিজের হাতে বানানো তলোয়ার পরিহাস করে তার অক্ষমতাকে। গল্পে, এক ঝলক হলেও, নুরু মণ্ডলের উপস্থিতি প্রবল। ছানিপড়া চোখে অস্ত্রোপচারের জন্য চেয়ারম্যানের কাছে সাহায্য চাইতে ছেলে আসমতের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে দরিদ্র নুরু মণ্ডল। তার পরিষ্কার জবাব– 'দুনিয়াডারে আল্লা অনেকদিন তো দ্যাহালোই, আর শ্যাষকালে যদি দেখতি না দ্যায় দ্যাখপো না! তাই বইলে সরদারের নাতির কাছে হাত পেতে চোখ ভালো কত্তি হবি? এ শালার চোখ থাক আর যাক, তা পারবো না।'[৩৯] তেভাগা আন্দোলনের সংগ্রামী যোদ্ধা নুরু মণ্ডলের 'দপ করে জ্বলে ওঠা চোখ' এবং তেজোদ্দীপ্ত আপোষহীন অবস্থান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটা ও মালপদিয়ার রমণী মুখুজ্জে' গল্পে সাম্প্রদায়িক হুমকি ও ডাকাতের বল্লমের খোঁচা খেয়েও অটল, দৃঢ়চেতা মোহান্ত মণ্ডলের হার-না-মানা প্রতীজ্ঞা–'না থাইকা উপায় কি, নিজের বাড়ি ঘর জাগা জমিন, থাকতেই হইব।'[৪০] আত্মমর্যাদা ও শ্রেণি-চরিত্রের আগুন নুরু মণ্ডল ও মোহান্ত মণ্ডল দুজনকেই প্রবলভাবে অস্তিত্ববান নিখাদ সত্তায় পরিণত করেছে।

অনেকগুলি দৃশ্যের কোলাজ 'খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং' গল্পে এক অভিন্ন রূপচিত্র গড়ে তুলেছে। রেলস্টেশনের অদূরে নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্যের একাংশে পরিত্যক্ত দরজাখোলা মালগাড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে আখ চিবুনো এক 'ঢ্যাঙা ছোকরা'র অস্থির প্রতীক্ষা; ফড়িং, শালিক, টুনটুনির আর ট্রেনের আসা-যাওয়ার ব্যস্ততা; কতবেলতলায় 'নির্জীব পুটলি'র মতো বসে থাকা এক বৃদ্ধ; বাজার-ফেরত মধ্যবয়স্কদের হতাশ্বাস; দূর থেকে প্রবেশ করে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ একদল ছেলেমেয়ের সাথে বেগুনি রঙের আধময়লা ডুরে শাড়ি পরা ফর্সা কিন্তু তেলহীন রুক্ষ চুলের একটি মেয়ে। মেয়েটিকে নিয়ে বরজের পাশে জগডুমুর আর কলাগাছের ছায়ায় সম্ভোগে মেতে ওঠে সেই ছোকরা। একই সময়ে, অন্যদিকে, ট্রেনে কাটা পড়ে আত্মহত্যার দৃশ্য তৈরি হয়। কেউ জানে না কেন এই আত্মহত্যা– 'মানুষের মরার জন্য কি কারণের অভাব, বেঁচে যে আছি এই তো ঢের!'[৪১] মৈথুনসুখ নিয়ে ঘরে ফেরা ছোকড়া এসবের কিছুই জানতে পারে না। এই কোলাজধর্মী গল্পে উপস্থিত প্রত্যেকের জীবন টুকরো টুকরো হয়ে প্রকৃতির নিত্যতার মধ্যে হারিয়ে যায়। মানব অস্তিত্বের নিরর্থকতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬.

কায়েসের গল্পে এমন কিছু চরিত্র পাওয়া যায়, যাদের নিরুপায় আত্মসমর্পণ কয়েকটি অবধারিত প্রশ্নের জন্ম দেয়– অমোচনীয় দুঃখ-গ্লানি-ব্যর্থতায় জর্জরিত মানুষের জীবনে পরাজয় বা বিনাশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কেন? তিনি কি জীবনের কোনো সদর্থকতা খুঁজে পাননি? যে জীবন কোনো মহৎ বা ইতিবাচক পরিণতির সন্ধান পায় না অথবা পাওয়ার সব পথ রুদ্ধ, এমনকি তার নিষ্কৃতি চাওয়ার মতো বাস্তবতাও নেই সেই জীবনের জয়গান গেয়ে হাততালি কুড়ানোর লেখক কায়েস নন। তাই তার চরিত্রেরা 'অনাবশ্যক লড়াকু নয়– লেখকের ইচ্ছাপুরণে তৎপরও নয়। ... কোনো তত্ত্বীয়, কেতাবি বা লেখকমনের আশাবাদ চড়িয়ে দেননি তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রে।'[৪২] সুশান্ত মজুমদারের এই মন্তব্যে সহমত পোষণ করেও বলা যায়, কায়েসের গল্পে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার উদ্বোধন যেমন পাওয়া যায়, আবার কয়েকটি গল্পের আখ্যানে কেবলই মৃত্যুর ভয়াল আবহ থাকে, মৃত্যু থাকে না; থাকে শূন্যতার বোধ অথবা বিনাশের দিকে যাত্রা। তেমন এক গল্প 'যাত্রা'; ভুল স্টেশনে নেমে পড়া, আতঙ্কিত, বিপন্ন এক যাত্রীর মনোবিকারের গল্প। সমগ্র দেশটাই যেন সেই যাত্রীর প্রতীকে অন্ধকার অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে যাত্রা করেছিল যে '... প্রতিপদে অনুভব করছিলো বেঁচে থাকা তার কাছে কী বিপুলভাবে কাম্য।'[৪৩] 'বন্দী দুঃসময়' গল্পে জীবনের অর্থহীনতা মধ্যবিত্ত তরুণ বাবুলের কাছে টেবিলের ওপর জলের ঘেরাটোপে আবদ্ধ পিঁপড়ার মতো প্রতিভাত হয়। এক পুনরাবৃত্ত অচরিতার্থতার মধ্যে সে খাবি খায়, অনতিক্রম্য এবং ক্রমশ ছোট হয়ে আসা বৃত্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে পিঁপড়ার মতো বাবুলও চেষ্টা করে কিন্তু 'চতুষ্পার্শ্বের বৃত্ত ক্রম-সংকীর্ণ হতে হতে শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে হত্যা করবেই।'[৪৪] 'বিবমিষা' গল্পের রকিবের আরেক রূপ 'বন্দী দুঃসময়ে'র বাবুল। এ ধারার গল্পে শহুরে মধ্যবিত্তের মনোজগতে অন্তর্লীন বিষণ্নতা, অচরিতার্থতা ও মনোবিকলন প্রাধান্য পায়। পূর্বোদ্ধৃত 'জীবন' ছাড়াও এ ধারায় আছে 'সম্পর্ক', 'প্রতারক জোস্না', 'মরচের বাহার', 'বৃষ্টির নদী' 'পাশাপাশি'। গল্পগুলি মনোলোগধর্মী, চরিত্রের জটিল মনোবিকলন চেতনাপ্রবাহরীতিতে বিন্যাস্ত। গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য হলো, আখ্যানে শহুরে মধ্যবিত্তের অবসাদ, আত্মপ্রতারণা ও আত্মরতির প্রাধান্য। যেমন, নিঃসঙ্গ শূন্যতাবোধ থেকে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত অঞ্জলির আত্মহনন-প্রস্তুতির মনোলোগ 'প্রতারক জোস্না'। অঞ্জলির আত্মহনন এবং রুণুর ['জীবন'] 'অসহ্য সুন্দরের' কাছে আত্মবলি, মৃত্যুকে আরও রহস্যময় করে তোলে। 'জীবন' গল্পের কাহিনিও মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই। তা-ও আত্মহত্যা! 'নির্জলা মদের নেশার মতো তীব্র, ঝাঁঝালো, অসহ্য এক আনন্দময় অনুভূতির নামই জীবন' এই উপলব্ধি যার সে-ও একদিন আত্মহত্যা করে, কেন করে? তার উত্তরে কায়েস সংশয়ী– 'বস্তুত আমরা কেউই কাউকে চিনি না।'[৪৫] 'ছোটলোকের ছোটলোক' যারা তাদের তুলনায় মধ্যবিত্তের মনোজগতে জীবনের নিরর্থকতা, আত্মপীড়ন ও বিনাশভাবনা প্রাধান্য পায়; তাদের অস্তিত্বচেতনায় স্বাধীন ইচ্ছার স্ফূলিঙ্গ নেই, প্রতিবাদ ও দ্রোহের পুঞ্জিভূত আগুন নেই, অস্তিত্বের স্থূল-প্রকট উপস্থিতিও নেই। মধ্যবিত্তের সম্ভাবনাহীন, ম্যাড়মেড়ে, অবসাদগ্রস্ত মনের গভীরে কায়েস আহমেদের অস্বস্তিকর অনুসন্ধানকে সমালোচক এভাবে সনাক্ত করেছেন–

> ক্যানো জীবনে ফলবান সম্ভাবনা নেই, আর ক্যানোই বা জীবনকে অর্থবহ করে তোলা দুরূহ' এই প্রশ্ন তোলা যায়। রীতিমত চরিত্রের ময়নাতদন্ত এবং তার অবস্থানের কাটা-ছেঁড়া করে কায়েস আহমেদ এই বিবেচনা পাঠকের কাছে গচ্ছিত রাখেন যে, জীবন আজ শাঁসশূন্য, জীবনের

> আবশ্যক শর্ত পূরণও দুঃসাধ্য-প্রতিপক্ষ দমন ও রক্তপাত ছাড়া মানুষের জন্য আর কিছু বরাদ্দ করে নি।[৪৬]

৭.

মৃত্যুর বহুকৌণিক-বহুমাত্রিক পর্যবেক্ষণ কায়েসের গল্পে অস্তিত্ববাদী অভিক্ষেপের স্বাতন্ত্র্য। কেবল মানুষ নয়, পশু-পাখিও বাদ যায় না এই পর্যবেক্ষণ থেকে। কখনও মৃত্যু-দৃশ্যের ভয়াবহতাও কায়েস উপভোগ্য দৃশ্যের মোড়কে হাজির করেন, অদ্ভুত ও নির্বিকার নির্মমতায়। মৃত্যুকে পরিহাসে (irony) বিদ্ধ করার এমন দৃষ্টান্ত কায়েস-মানস নিরূপণে সহায়ক। 'খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং' গল্পে ট্রেনে-কাটা-পড়ে আত্মহত্যার বর্ণনায় উপভোগের ভাষা পাই–

> কালচে-ধূসর খোয়ার ওপর লাল রঙ ভারী মানিয়েছে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে বুকের হাঁ করে থাকা পাঁজরের কাঠামোর ভেতরকার কলজে ইত্যাদির ওপর। সবচেয়ে দারুণ দেখাচ্ছে মুণ্ডুহীন গলাটা। থকথকে চর্বির সঙ্গে লালের ছোপ, তার ওপর সূর্যের কটকটে আলো– মানুষগুলোকে একেবারে অভিভূত করে দিয়েছে।[৪৭]

এমন বিকৃত আনন্দ পেতে দেখি 'মহাকালের খাঁড়া' গল্পে সুরেন-হত্যাকারীদেরকে। এভাবে, 'অন্তর্লীন চখাচখী'র পল্টুকে সাপে কাটার পর 'কাজটা বোধ ভালো করলাম না' এমন লজ্জিত ভঙ্গিতে সাপের চলে যাওয়া; 'গন্তব্য'তে কামিনীর মৃত্যু নিশ্চিত করার পর শামুর অভিব্যক্তি নিয়ে কায়েসের রসিকতা-'এমন ম্যাড়াকার্ত্তিকে চেহারা হয় তার চোখ-মুখের যে, বেঁটে কুলগাছটার ওপর বসে থাকা টুনটুনিটাও ফিক করে হেসে উড়ে যায়।'[৪৮]– এসব দৃষ্টান্তে মৃত্যুবর্ণনা, পাশবিকতার ব্যবচ্ছেদ এতটাই সবিস্তার ও নিরাবেগ যে, প্রায় নির্মমতার পর্যায়ে পড়ে।[৪৯]

'নিরাশ্রিত অগ্নি'র ফজর আলী, 'দুই গায়কের গল্প'-এর জগন্নাথ, 'গোপাল কামারের তলোয়ার'-এ তেভাগা আন্দোলনের লড়াকু যোদ্ধা নুরু মণ্ডল একই অনমনীয়তায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকা 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটা ও মালপদিয়ার রমণী মুখুজ্জে' গল্পের মোহান্ত মণ্ডল, 'নিয়ামত আলীর জাগরণ' গল্পের নিয়ামতের শীর্ণ দেহ, জীর্ণ আশ্রয়, শূন্যতায় সমর্পিত জীবন, উত্তরণহীন বর্তমানের মধ্যে আকস্মিকভাবে সমগ্র অস্তিত্ব নিংড়ানো যে-প্রতিবাদ গর্জে ওঠে– সমাজে তেমন মানুষই চেয়েছিলেন কায়েস। এই প্রতিবাদীচেতনার মধ্যে যে-সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হয় কায়েসের গল্পে তা বারবার ধরা পড়ে। সমাজের চোখে একেবারে প্রান্তিক, বিলীয়মান অস্তিত্বের তুচ্ছ মানুষের মধ্যেও যে আত্মসম্মানবোধ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে এবং সেখান থেকে জন্ম নেয় ক্ষোভ। পুরুষানুক্রমে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, পিষ্ট হতে থাকা মানুষগুলো ঠিক যখন দপ করে জ্বলে ওঠে, তাদের প্রতিবাদের রোষানল সারা পৃথিবীটাকে অঙ্গার করে ফেলতে চায়, আঁকড়ে ধরতে চায় অস্তিত্বের ন্যূনতম চিহ্নটুকু সেই মুহূর্তের খুব ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত রূপ গল্পে সফলভাবে তুলে আনতে পেরেছেন কায়েস। যদিও অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কেউ কেউ মনে করেন, মৃত্যু আমিত্বের সম্ভাবনা তৈরি করে না, জীবনকে তার অর্থ প্রদান করে না; 'মৃত্যু বিনাশ নয়, সত্তার মাঝেই নিহিত রয়েছে শূন্য এবং শূন্যতার বিনাশের জন্য আবশ্যিক অবস্থাই স্বাতন্ত্র্য।'[৫০] সুতরাং স্বাতন্ত্র্য প্রকারান্তরে শূন্যতাবোধকে নির্মূল করে। পরাজয়ের গহ্বরে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা ডুবে যেতে পারে না, তাকে অবশ্যই উঠে আসতে হবে। কারণ সামগ্রিক সত্তার তথা সমষ্টিগতভাবে মানবজাতির প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মৃত্যু নির্বাচনে মানুষ স্বাধীন নয় বরং তা মানুষের ওপর আরোপিত অনিবার্যতা যার ওপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব নেই– এই 'এ্যাবসার্ডিটি' সত্ত্বেও কোথাও না কোথাও মানুষ তার অস্তিত্বের

তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং নিজকে আবার ফিরে পেতে চায় নিত্যনতুন পরিবর্তমান প্রকৃতির মধ্যে। এই সূত্রে কায়েস আহমেদের গল্পে মধ্যবিত্তের চেয়ে নিম্নবিত্তের প্রান্তিক মানুষগুলির মধ্যে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বসংকট অনেক বেশি, বিনাশী ভাবনাও কম নয়, কিন্তু প্রতিদিনের প্রকৃতির নতুনত্বের মধ্যে নতুনভাবে জীবনকে পরখ করে নেওয়ার সুযোগ-সম্ভাবনাও বেশি। পক্ষান্তরে কায়েসের গল্পের মধ্যবিত্ত আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মরতি ও বিচ্ছিন্নতায় অবসিত, ফলে শূন্যতায় মুক্তিসন্ধানী– তারা আত্মঘাতী বা খঞ্জ, স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের বাইরে কোনো প্রাণ-প্রকৃতি ঐ অন্ধকারে প্রবেশ করতে পারে না। কায়েস আহমেদ তাঁর লেখায় যে-মানুষ সন্ধান করেছেন আমৃত্যু তা নিশ্চয়ই খঞ্জ মানুষ নয়, প্রবলভাবে অস্তিত্ববান মানুষ। সমাজ ও শ্রেণিকাঠামোর মধ্যে তাদের অবস্থানের তারতম্য আছে, কায়েস আহমেদ সেই ব্যবধানকে সনাক্ত করেছেন। তিনি চিহ্নিত করেছেন মানুষের মহোত্তম সম্ভাবনা বিত্ত-বৃত্তীয় শ্রেণিভেদে অবসিত হয় না, অস্তিত্বচেতনার সারার্থে তা নিহিত। কায়েসের অস্তিত্বজিজ্ঞাসার মধ্যে এই সংশ্লেষ বিদ্যমান।

তথ্যনির্দেশ

১ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* (ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১২৭; আরও দেখুন: 'ভূমিকা', *কায়েস আহমেদ সমগ্র* (ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৩)

২ *তদেব*

৩ কানিজ ফাতেমা, 'কায়েস আহমেদের গল্প: আখ্যানতাত্ত্বিক পাঠ', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খণ্ড ৩৭, সংখ্যা পৌষ, ১৪২৬, পৃ. ৩৩৪

৪ প্রশান্ত মৃধা (সম্পাদিত), *অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ* (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১০), পৃ. ২৩৩

৫ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১২৫-১৩২

৬ চঞ্চলকুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ ১৯৭১-১৯৯৬* (ঢাকা:বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ৩১৩-৩১৭

৭ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশে ছোটগল্প: বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল* (ঢাকা:বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ৫৩৫-৫৪৭

৮ দেখুন- কানিজ ফাতেমা, পূর্বোক্ত; চঞ্চলকুমার বোস, পূর্বোক্ত; আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত

৯ শরীফ হারুন, *জ্যাঁ পল সার্ত এবং অস্তিত্ববাদ* (ঢাকা:উচ্চারণ, ১৯৮০), পৃ. ২৭-২৮

১০ নীরুকুমার চাকমা, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা* (ঢাকা:বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ২৭

১১ জাঁ-পল সার্তে, *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ*, অনুবাদ অধ্যাপক মো. বজলুল করিম (ঢাকা:বইপত্র, ২০১৩), পৃ. ২৬

১২ শরীফ হারুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৩ অধ্যাপক মো. বজলুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

১৪ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *স্বদেশ ও সাহিত্য* (ঢাকা:বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯), পৃ.১২১

১৫ শওকত আলী, 'কায়েস আহমেদ ও তার প্রাসঙ্গিকতা', *কায়েস আহমেদ : নিরাবেগ বোঝাপড়া* (ঢাকা:সন্দেশ, ১৯৯৪), পৃ. ২২

১৬ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'মরিবার হল তার সাধ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

১৭ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

১৮ কায়েস আহমেদ, 'জীবন', *উত্তরপর্ব*, মাহবুব লিটন সম্পাদিত, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ সংখ্যা, ঢাকা, ২০২৪, পৃ. ৬০
১৯ তদেব, পৃ. ৬১
২০ মার্টিন হাইডেগার, উদ্ধৃত, শরীফ হারুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
২১ হায়াৎ মামুদ, 'চক্ষুষ্মান তীরন্দাজ', *নিরাবেগ বোঝাপড়া*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
২২ কায়েস আহমেদ, 'নিরাশ্রিত অগ্নি', *কায়েস আহমেদ সমগ্র* (ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৩), পৃ. ১৭৮
২৩ তদেব, পৃ. ১৭৯
২৪ তদেব, পৃ. ১৮০
২৫ শরীফ হারুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
২৬ কায়েস আহমেদ, 'নিরাশ্রিত অগ্নি', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২
২৭ কায়েস আহমেদ, 'দুই গায়কের গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
২৮ তদেব, পৃ. ১৪৪
২৯ তদেব, পৃ. ১৪৫
৩০ কায়েস আহমেদ, 'নিয়ামত আলীর জাগরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১
৩১ তদেব
৩২ কায়েস আহমেদ, 'অন্ধ তীরন্দাজ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
৩৩ কায়েস আহমেদ,'গন্তব্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৩৪ তদেব
৩৫ তদেব
৩৬ তদেব, পৃ. ৭২
৩৭ তদেব, পৃ. ৭৫
৩৮ হায়াৎ মামুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
৩৯ কায়েস আহমেদ, 'গোপাল কামারের তলোয়ার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬
৪০ কায়েস আহমেদ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটা ও মালপদিয়ার রমণী মুখুজ্জে', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬
৪১ কায়েস আহমেদ, 'খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৪২ সুশান্ত মজুমদার, 'খঞ্জ মানুষ ও মৃত্যুর উৎসব', *অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
৪৩ কায়েস আহমেদ, 'যাত্রা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৪৪ হায়াৎ মামুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
৪৫ কায়েস আহমেদ,'জীবন', *উত্তরপর্ব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
৪৬ সুশান্ত মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২
৪৭ কায়েস আহমেদ, 'খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৪৮ কায়েস আহমেদ, 'গন্তব্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৪৯ দেখুন- 'প্রতীক্ষিত লণ্ঠন', 'পাশাপাশি', 'নিরাশ্রিত অগ্নি', 'অন্তর্লীন চখাচখী'
৫০ শরীফ হারুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩